এই দিন আর সেই দিন

দেশ ছেড়ে প্রবাসী হয়েছি চার বছর। খুব বেশী লম্বা সময় নয়। একসময় প্রবাসী হওয়ার বিষয়টি ছিল সামাজিক মর্যাদার মত। কিন্তু আমরা যে সময় প্রবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই তখন নিরাপত্তা ছিল মুখ্য বিষয়। দেশ ছেড়ে সিডনীর খোলা বাতাসে যখন হাত পা ছেড়ে নতুন করে বসতি গড়ার সংগ্রামে জড়িয়ে গ্যাছি, তখনও মনের কোনে বার বার একটি প্রশ্ন এসে সজোড়ে কড়া নাড়ত-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-র প্রিয় চত্বর, প্রিয় মানুষগুলোর সাথে।

-আবার কবে যাবো বাংলাদেশে?

-সেই টিএসসি, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর কি আগের মত সাংস্কৃতিক কর্মীর পদচারনায় মিলন মেলা হয়ে উঠে?

-আমার মহিলা সমিতি? কেমন আছে সেই মানুষ গুলো?

সেই পুরোনো মানুষ আর জায়গা গুলোকে দেখার ইচ্ছা গত চার বছর ধরেই মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। সাধ আর সাধ্য বলে তো কথা। কখনও মনে হয়েছে মাত্র তো চার বছর। এখনই কেন দেশে যেতে হবে? হটাৎ করে গত অগাষ্ট মাসে ঢাকা যাবার আমন্ত্রন এলো। ঢাকার একটি টেলিভিশনের জন্য প্রবাসীদের জীবন যাত্রার উপর একটি লম্বা টেলিভিশন সিরিয়াল তৈরী করা হবে। এই পুরো টেলিভিশন সিরিয়ালের উপদেষ্টা হবেন মামুনর রশীদ। আমন্ত্রন এলো তার কাছ থেকে। মামুন ভাইয়ের সাথে আমার নাটকের সম্পর্ক সেই আশির দশক থেকে। আমাদের নাটক দেখে অকপটে বলতো -'মার্টিন, মঞ্চে তুমি আমার প্রিয় অভিনেতা'। এই নিয়ে ঢাকা পদাতিকের অন্যদের সাথে আমার বেশ রসাল কথা শুনতে হোত। মামুন ভাই আমাদের সবগুলো নাকই দেখেছেন। বিভিন্ন সময় নাটক নিয়ে কথা হয়েছে। বিদেশে এসে আবার সেই মামুন ভাইয়ের সাথে নাটকের কাজ করবো -এটা অনেকটা স্বপ্নের মত। সিরিয়ালের প্রথম ৩০ পর্ব লেখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলো। যেহেতু নাটকটি লিখবো তিন জন মিলে অতএব নাটকের স্টোরি লাইন তিনজনে মিলে ঠিক করা দরকার। তাই আমন্ত্রন এলো আমি যেন ঢাকা যাই। আহা ! এমন একটি আমন্ত্রনেরইতো অপেক্ষায় ছিলাম।

বছরের শুরুতেই ঠিক করেছি যে ২০০৫ এ আমরা সপরিবারে আমেরিকা যাব। ওখানে তো আমার আর মৌসুমীর পরিবারের অর্ধেক মানুষ থাকে। টিকেট কাটা, আমেরিকায়

কোথায় কোথায় ঘুরবো- তার লম্বা প্ল্যান মৌসুমী আর ঋভু সারা বছর ধরে করল। অফিস থেকে পাঁচ সপ্তাহের ছুটি নিয়ে রাখলাম। এখন এই বাংলাদেশে যাবার জন্য যদি আমেরিকা সফর সংক্ষিপ্ত করি তাহলে আর সিডনীতে থাকা যাবে না। কিন্তু ঢাকা তো যেতেই হবে। তারপর আবার নাটকের কাজ। অতএব আটকায় কে? অফিসের ম্যানেজার কে বুঝিয়ে অতিরিক্ত ১৩ দিনের ছুটি ম্যানেজ করে নিলাম। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন।

ঢাকা যাবার উত্তেজনায় খেয়াল করিনি যে চার বছর পর ঢাকায় আমার একা যাবার বিষয়টি মৌসুমীর কষ্ট লাগবে। সত্যিইতো যে টিএসসি, মহিলা সমিতি ,বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে আমি পুরোনো স্মৃতি খুঁজতে যাব -সেখানে তো মৌসুমীও আছে। আমাদের সেই সব দিনের পদচারনায় মৌসুমীও অংশীদার। সাধ আর সাধ্যের হিসাবটা মৌসুমী মেনে নিল। কষ্টটা বুকে চেপে রাখল। কিন্তু সাথে দিয়ে দিল ওর স্মৃতির লম্বা লিষ্ট। মাত্র ১৩ দিনের সফর। সিডনী থেকে যেতে আসতেই চার দিন। সেই নাটক লেখার কাজ আপাতত ঠিক করা হয়েছে পাঁচ দিনের জন্য। বাকী থাকে চার দিন। চার দিন আমি মুক্তপাখীর মত ঘুরবো প্রিয় ঢাকাতে। প্লেনে বসে কত পরিকল্পনা করলাম। ভাবলাম লক্ষীবাজারে যাব- যেখানে আমার শৈশব আর যৌবন কেটেছে। টিএসসি তে গিয়ে অনেকক্ষন বসে থাকব। জানি সেইসব পুরোনো বন্ধুদের পাব না। কিন্তু সেই পুরোনো কর্মচারীরা নিশ্চয় আছে? ওরা যে আমাদের কতভাবে সাহায্য করেছে তার হিসাব দেয়া কঠিন।

আমরা টিএসিতে ইংগিত নাটকের রিহার্সল করছিলাম। তখন ঐ এরশাদ এর শাসনামল। পুলিশএর ট্রাক ছাত্রদের উপর উঠিয়ে দিল। সম্ভবত দুজন ছাত্র মারা গিয়েছিল। আমরা রিহার্সেলে বসে সে খবর পেলাম। সোলায়মান ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন -যে রিহার্সেল চলবে। আমরাও রিহার্সেল করছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ টিএসসির কর্মচারী মোস্তফা এসে জানাল টিএসসির সামনে পুলিশের গাড়ী এসেছে । ছাত্ররা সব টিএসি ছেড়ে চলে গ্যাছে। টিএসসি খালি। পুলিশ ভিতরে আসতে পারে। আমাদের পক্ষে ঐ সময় সব গুছিয়ে টিএসসি থেকে পালানো সম্ভব ছিল না। নির্ঘাত পুলিশের লাঠির বারি খেতে হবে। নতুবা নির্ঘাত জেলে। কারন পুলিশ তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এলোপাথারী যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে, নতুবা লাঠি পেটা করছে। মোস্তফা সাথে সাথে সমাধান দিয়ে দিল।

পাভেল, জহির, মামুন ভাই, মাহফুজ এবং আমি। মনে হলো ফিরে গেছি পুরানো দিনে।

-আপনারা আমাগো কোর্য়াটারে চইলা যান। আমাগো ঘরে গিয়া চা খান। আমি মেইন গেইট বন্ধ কইরা দিয়া আসছি। পুলিশ মনে হয় ভিতরে ঢুকবো না।

টিএসসির গেমস রুমের ঠিক পিছনে কর্মচারীদের কোয়ার্টারে আমরা চলে গেলাম। পরে রাত দশটার দিকে সবাই এক এক করে বেড়িয়ে গেলাম। সেই স্মৃতি বিজরিত টিএসসিতে একটি সন্ধ্যা কাটাবো না তাকি হতে পারে? কিন্তু ঢাকায় নেমে দেখলাম অন্য বাস্তবতা। হাতে সময় কম হলে কি হবে-মন তখন এতই তৃষ্ণার্ত যে ঐ চার দিনে স্কুলের পুরো বন্ধু থেকে শুরু করে নাট্যকর্মী, নিজের ভাই বোন- এবং সর্বপরি শ্বশুর বাড়ীর মানুষ -সবার সাথেই দেখা করার এক মহা প্রলঙ্কারী পরিকল্পনা করে ফেললাম। ভুলেই গেলাম যে ২৪ ঘন্টায় দিণ এবং এর মধ্যে ৮ ঘন্টা আবার ঘুমাতে হবে। ঢাকায় নেমে দেখলাম নাটক লেখার একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে মধুপুরে। কারন একটাই- কেউ যেন বিরক্ত না করে। মধুপুরের বিএডিসি-র বাংলোয় মামুনভাই, আজাদ আবুল কালাম (ওকে আমি পাভেল নামেই চিনি। একসাথে মহিলা সমিতিতে নাটক করেছি দীর্ঘ সময়), ফয়েজ জহির, গোলাম মোস্তফা এবং আমি- এই পাচঁজন বসে গল্পের প্লট ঠিক করছিলাম। এর মধ্যে বৃষ্টি আমাদের জন্য আর্শীবাদ হয়ে এলো। পাচঁদিন একটানা বৃষ্টি। অতএব, যতই ফাঁকি দিতে চাইনা কেন- উপায় নেই। আমার একমাত্র ভরসা তখন ঐ মোবাইল ফোন। ঢাকায় পা দিতেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহাপাঠি মিঠুর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। ও এখন গ্রামীন ফোনের সেলস্ এর এম ডি। আমাকে একটা ফোন পাঠিয়ে দিল। তার বন্ধুত্বে আমি মুগ্ধ হলেও সেই ফোন মধুপুরে ঠিক মত কাজ করছিল না বলে- বেচারা এক ইঞ্জিনিয়ার প্রায় ঢাকা থেকে মধুপুরে এসে আমার ফোন ঠিক করে দিতে চাইল। আহা -এম ডি সাহেবের বন্ধু বলে কথা। মামুন ভাই আর পাভেল আমার এই বন্ধুভাগ্যে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর টেলিফোন ধরা যাবে না। এবার শুধু কাজ।'

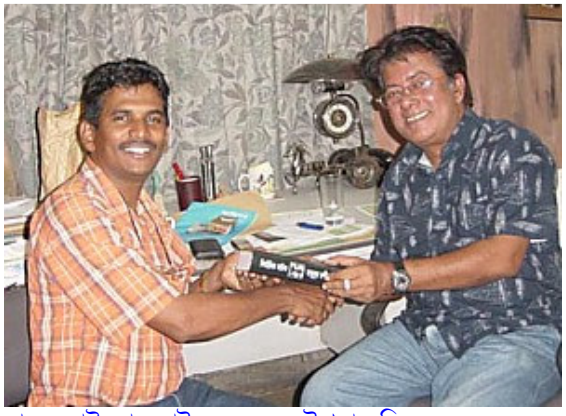
মামুন ভাই তার নাটক সংকলন উপহার দিলেন।

একটানা পাঁচ দিনে আমরা অবিশ্বাস্য কাজ করে ফেললাম। ত্রিশ পর্বের লাইন আপ করে ফেললাম। অর্থাৎ এখন কেবল পর্ব অনুযায়ী স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। আমি শুধু গুনছিলাম আমার নিজস্ব সময় কখন শুরু হচ্ছে। কখন নাটক দেখতে যাব? আমার ভাগ্য খুব একটা ভাল বলব না। কারন তখন রোজা শুরু হয়েছে। মহিলা সমিতিতে নাটকের সংখ্যা কম। তবুও খোঁজ নিলাম। ঠিক হলো সন্ধ্যায় নাটক দেখতে যাব।

মাহফুজ এখন জনপ্রিয় তারকা। মাহফুজ ঢাকা পদাতিকের একজন নার্টকর্মী। আমার অনেক নাটকের ওয়ার্কশপ ও করেছে। ও কোথায় যেন জেনেছে আমি ঢাকায় এসেছি। এক সকালে আমার ভাইয়ের বাড়ীতে এসে হাজির। ও সেদিন সুটিং করার জন্য নেপালে যাচ্ছিল। এয়ারপোর্টে যাবার পথে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল,'আপনি ঢাকা আসছেন -আর আমি দেখা করব না? কি বলেন?' নাদের চৌধুরী ফোন করল। নাদেরও সেদিন নেপালে সুটিং করতে যাচ্চে। নাদের আর আমি দীর্ঘদিন অভিনয় করেছি একসাথে,একই গ্রুপে। নাদেরের সময়ের সাথে আমার সময় মিললো না। আক্ষেপ করে বলল-'আপনার সাথে চোখের দেখাটাও হোল না।'

এদিকে ঢাকায় গিয়েছি ছয় দিন হয়ে গেছে অথচ মৌসুমীর মায়ের সাথে দেখা করিনি। বিষয়টা একটু জটিল হয়ে উঠছিল। কিন্তু কি করব? হিসাব করে দেখলাম যে, আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে গেলে নাটক দেখা হবে না। কিন্তু চার বছর পর ঢাকায় গিয়ে শ্বাশুড়ীর সাথে দেখা করব না-বিষয়টা বোধহয় মৌসুমীরও ভাল লাগবে না। অতপর সাহস সঞ্চয় করে মৌসুমীর মাকে এক ভয়াবহ প্রস্তাব দিলাম। বললাম যে সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে বৌবসন্তি নাটক দেখতে যাব,উনি যেন মহিলা সমিতিতে আসেন। আমরা এক সাথে নাটক দেখব। সন্ধ্যাবেলা আমি ঠিক সময়মত মহিলা সমিতিতে গিয়ে হাজির। খুঁজে বের করলাম তারাভাই কে। তারাভাই আমার ডান হাত চেপে অনেকক্ষন চুপ করে রইলেন। আমার চোখ ছল ছল করে উঠল। ঋভু যখন ছোট তখন তারাভাই মহিলা সমিতির পাশে ক্লাশরুম খুলে দিত। মৌসুমী ঋভুকে নিয়ে সেখানে বসে থাকতো আর কেবল সময় মত মঞ্চে ঢুকে বিষাদসিন্ধু নাটকে অভিনয় করত। আমার হাত ধরে তারাভাই কি সেইসব স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়িয়েছে? তারাভাই মহিলা সমিতির কেয়ার টেকার। পাশাপাশি শো চলাকালে চিপস, ড্রিংকস বিক্রি করে। ঋভুকে কত চিপস আর ড্রিংস দিয়েছে! হয়ত তারাভাই এর সেইসব কথাই মনে পড়ছিল। ভারী গলায় জিঞ্জেস করল-

-আপনি একলা আসছেন? মৌসুমী আপা কেমন আছে? আর ব্যাটা টা কত বড় হইছে?

গত চার বছরে এই মানুষটার কোন খোঁজ নেইনি। আসার আগে বলেও আসিনি। অথচ কি আর্শ্চয্য আত্মার সম্পর্ক এই মানুষটির সাথে। অনেক ক্ষন কথা হলো। ততক্ষনে শো শুরু হয়ে গ্যাছে। আমি আমার শ্বাশুড়ীর জন্য আর অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে গেলাম। গেটে দুটা টিকেট রেখে দিলাম। নাটক শুরু হয়ে গ্যাছে। পনের মিনিট পর আমার শ্বাশুরী হলে ঢুকলেন। অন্ধকারে দেখলেন আমাকে চার বছর পর। কিন্তু কথা বলার উপায় নেই। নাটক চলছে। নাটকের বিরতীতে বাইরে বেরুলাম। দশ মিনিট। ঐ দশ মিনিটে রাজ্যের কথা জিঞ্জেস করলেন শ্বাশুড়ী আমার। কত প্রশ্ন আর কত কথা। নাটক শুরুর ঘন্টা বাজলো। আহারে আজ ঘন্টাটা একটু পরে বাজলে কি হতো?

নাটক শেষে যখন বাইরে বেরুলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। মৌসুমীর মায়ের সাথে ওর এক খালাতো বোন তনু এসেছে। আমার সাথে তার সম্পর্কটা মধূর হবার কথা থাকলেও ঐ অল্প সময়ে তা তিক্ততার পর্যায়ে গেল। শ্যালিকা আমার অভিমান করেই বলল, 'যান আপনি আপনার নাটক নিয়েই থাকেন। আমাদের সাথে কথা বলতে হবে না'। শত চেষ্টা করেও তাদের নিয়ে কোন রেষ্টুরেন্টে খেতে যেতে পারলাম না। কারন অনেক রাত হয়ে গ্যাছে। বাড়ীতে খালু মানে তনুর বাবা এতক্ষনে উত্তেজিত হওয়া শুরু করেছে। অতএব উনারা চলে গেলেন। মৌসুমী এই ঘটনা শুনে নতুন আদেশ পাঠাল। পরের দিন শ্বাশুড়ীকে ফোন করে শিল্পকলায় নাটক দেখতে আসতে বললাম। ওখানে আরণ্যকের 'চে'সাইকেল' মঞ্চস্থ হবে। আমার বড় ভাবী আর বড় ভাইও আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন। কিন্তু সময় কোথায়? সবাইকে ওখানেই আসতে বললাম। চোখের দেখা হলো। কথা হলো না। নাটক শুরু হয়ে গ্যাছে। নাটক শেষ হলো। খবর পেলাম সাইদুর রহমান লিপন-তার দল নিয়ে নাটমন্ডলে বসে আছে। আমাকে বেহুলার ভাসান নাটকটির রিহার্সল দেখাবে। কথা ছিল সন্ধ্যাবেলায় নাটকটির রিহার্সল শুরু করবে কিন্তু আমি চে

সাইকেল দেখবো বলে ওরা রাত সাড়ে ন'টায় রিহার্সেল শুরু করবে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। লিপন জানে আমাকে দাওয়াত দিয়ে মুরগীর রান খাওয়ানোর চেয়ে নাটক দেখালে অনেক বেশী খুশী হবো। ও তাই করল। শিল্পকলায় নাটক দেখে সোজা গেলাম নাটমন্ডলে। সাথে মৌসুমীর মাকেও নিয়ে গেলাম। উনি ততক্ষনে টেনশন করছেন-রাত হয়ে যাচ্ছে বলে। নাটমন্ডলে গিয়ে দেখলাম ওরা সবাই বসে আছে। শুরু হলো ওদের রিহার্সল। এই বেহুলার ভাসান এর কথা অনেক শুনেছি। আমার প্রিয় মানুষ জামিল আহামেদের নির্দেশনা । খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার আরেক ভাবী মিতা আর নেভেল দা ওখানে এসে হাজির। তাই তো- ওদের বাসায় থাকলেও ওদের সাথে কথা বলার সময় বের করতে পারিনি। থাক একসাথে নাটক তো দেখলাম ! বেহুলার ভাসান যখন শেষ হলো তখন রাত এগারো টা। আমি যাব মিতার সাথে সেই গুলশানে। শ্বাশুড়ী তার নিজের বাড়ী মালিবাগে তার বোনের সাথে থাকবেন। তার বোন আপাতত এই বাড়ীটা আগলে রেখেছেন। শ্বশুড়ী আমার ভীষন টেনশন করছেন।

টিএসসির রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ী দিয়ে বেরুচ্ছিলাম তখন জীবনের এক আশ্চর্য মুহূর্তকে অনুভব করলাম। ঠিক বিশ বছর আগে মৌসুমী যখন আমাদের সাথে নাটক করত তখন একটু রাত হলেই মৌসুমী টেনশনে পরে যেত বাড়ীর মানুষদের নিয়ে। একবার নাটক শেষ করে বাড়ীতে ফিরতে ফিরতে রাত তিনটা। তখন ঢাকা পদাতিকের মোস্তফা ভাইকে দিয়ে মৌসুমীকে ওদের মালিবাগ বাড়ীতে পাঠানো হলো। আজ বিশ বছর পর মৌসুমীর মা আমাদের সাথে নাটক দেখছে -সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের চত্বরে । রাত এগারোটা বেজে গ্যাছে। মৌসুমীর মা মৌসুমীর মতই টেনশন করছে- বাড়ীর মানুষদের নিয়ে- এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আমি আবার সেই ঢাকা পদাতিকের মোস্তফা ভাইকেই বললাম আপনি এবার উনাকে মালিবাগে পৌঁছে দিন।

জীবনের এ এক আশ্চর্য্যক্ষন। কেউ টের পায় কেউ পায়না ।

পুনশ্চঃ

যদিও কথা ছিল পাভেল নাটকের বাকী ২২ পর্ব লিখবে- কিন্তু আমি ঢাকা ছেড়ে চলে আসার কদিন পর পাভেল রোড একসিডেন্ট করলো। একেবারে বিছানায় শুয়ে রইল কয়েক সপ্তাহ। তারপর নাটকের কাজে চলে গ্যালো ডেনমার্ক। মামুন ভাই ফোন করে বললো, 'মার্টিন, পুরো বায়ান্ন পর্বই তোমাকে লিখতে হবে।' এখন প্রতিদিন হিসাব কষি -কতক্ষন জেগে আছি আর কতক্ষন নাটক লিখছি। মামুন ভাই তার দল নিয়ে সিডনী আসছে আগামী সপ্তাহে। আমার হাতে আছে ৪০ পর্ব। বাকী ১২ পর্ব অবশ্যই শেষ করতে হবে আগামী ৩০ দিনে।

জন মার্টিন
অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার
probashimartins@gmail.com